উপন্যাস

ভুতুড়ে দুপুর

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝাঁ-ঝাঁ দুপুর, বাড়ির সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে কেউ বা বিছানায়, কেউ বা মেঝেয় মাদুর পেতে টানটান হয়ে ঘুমোচ্ছে। এরকম একলা-সময়ে খিড়কি-দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সন্টু। বাড়ির পিছনে বিশাল বাগান। আম, জাম, কাঁঠাল থেকে শুরু করে বঁইচি, ফলসা, করমচা পর্যন্ত সবরকম ফলের গাছে ভর্তি ওদের এগারো বিঘের বাগানটা, তার মধ্যে শানবাঁধানো বিরাট পুকুর, চারপাশে সার দিয়ে নারকেল আর তালগাছ। বাগানে ঢুকে সন্টু চলে এল পুকুরপাড়ে, কাছাকাছি একটা লম্বা তালগাছের গায়ে গা লাগিয়ে বিশাল একটা রেন্‌ট্রি, তার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে জম্পেশ করে বসল।

তার হাতে একখানা ভূতের গল্পের বই। ভূতের গল্প ওর খুব ফেভারিট, সাধারণত রাত্তির ছাড়া ও ভূতের গল্প পড়ে না। যে-গল্পের যেরকম পরিবেশ, সেটাই ওর পছন্দ। এখন ভরদুপুরে তাদের বাগানের এই গা-ছমছমে পরিবেশেও ভূতের গল্প বেশ জমে উঠবে। এমনিতে ভূতকে খুব একটা কেয়ার করে না সে, বরং পোড়োবাড়ি দেখলেই রাতের অন্ধকারে উঁকিঝুঁকি দেবার লোভ ওকে মাঝে-মাঝে পেয়ে বসে. কিন্তু হয়ে ওঠেনি কখনও। বিল্টুদা এ-ব্যাপারে ওর জুড়ি, তার সঙ্গে রাতে তিনতলার ছাদে উঠে গাছগাছড়ার দিকে তাকিয়ে থেকেছে, হঠাৎ যদি কোনো ভূতবাবাজির রকমসকম ওদের নজরে পড়ে, কিন্তু কিছুতেই কিছু ঘটেনি।

গল্পটা পড়া শুরু করতেই পুকুরপাড় থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ভেসে এল একঝলক, শরীরটা জুড়িয়ে এল সন্টুর। গল্পটা পাড়াগাঁর। ভূত তো পাড়াগাঁয়েই বেশি থাকে, শ্যাওড়াগাছের ডালে, কিংবা চাঁপাগাছের পাতায়, কিংবা জোড়া অশত্থগাছের মগডালে বসে ওদের যত কাণ্ডকারখানা। কিন্তু এ গল্পটায় একটা

সূর্য্যের রশ্মি যখন অনবরত আপনার ত্বকের রঙ ময়লা করতে থাকে, আপনি কি ফর্সা হতে পারেন?

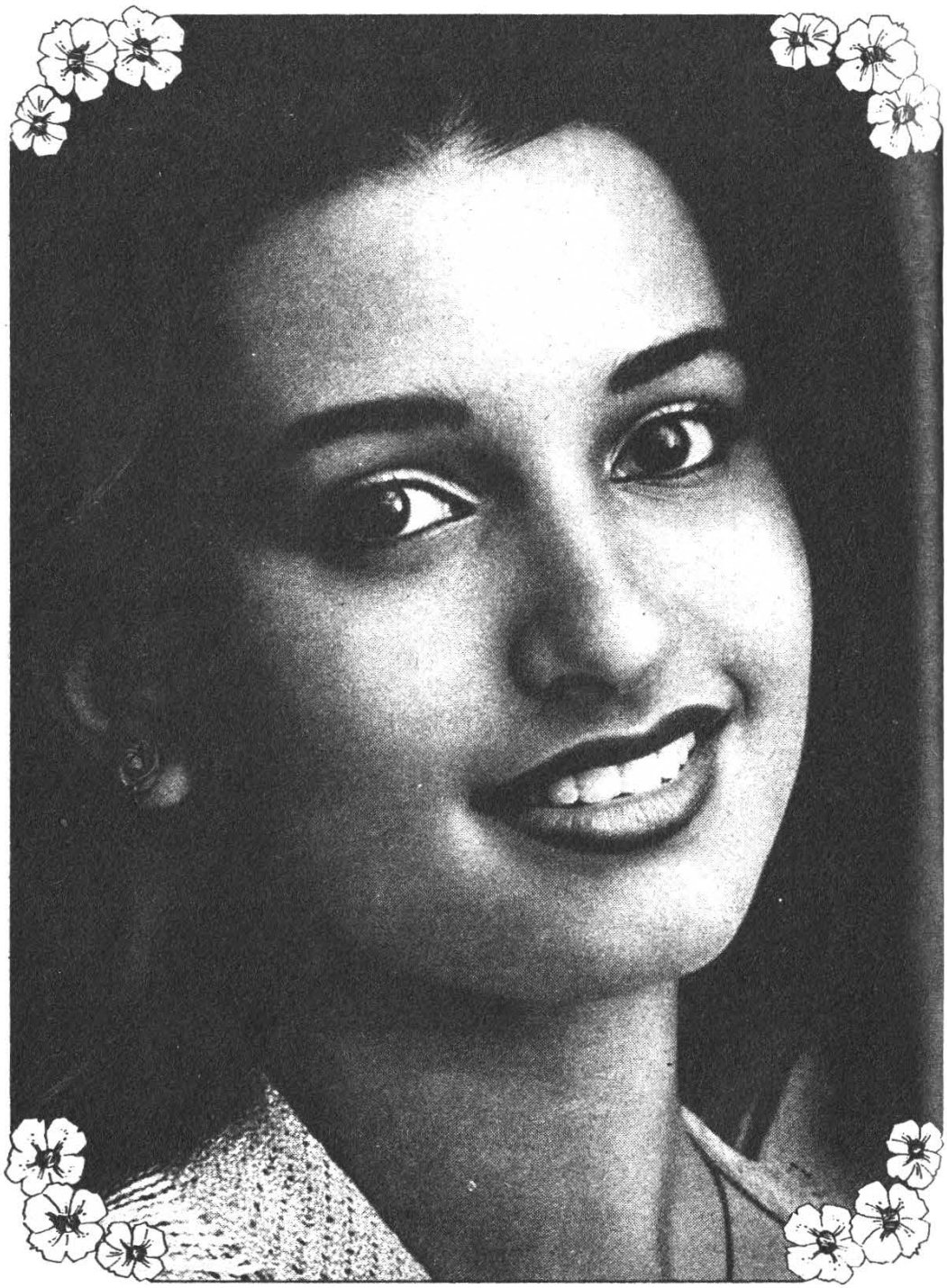

LINTAS FALOV-23 1926 BG

আপনি জন্মেছিলেন এক বিশেষ রঙ নিয়ে। কিন্তু আজ তা অনেক পর্দা ময়লা হয়ে গেছে। আপনি জানেন—সূর্যের আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি কত চট্ করে রঙ ময়লা করে দিতে পারে। কিন্তু ওটাই রঙ ময়লা হওয়ার একমাত্র কারণ নয়! আপনার ত্বকের ভেতরে মেলানিন নামে এক রঞ্জক পদার্থ আছে, যা কিছু ত্বকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশী ছড়িয়ে পড়ে—আর, যত বেশী ছড়িয়ে পড়ে, ত্বক তত বেশী কালো দেখায়।

রঙ ফর্সা করার কি নতুন কোনো উপায় আছে?

হ্যাঁ, আছে! এই প্রথম, বিজ্ঞানের এক নতুন আবিষ্কার—রঙ কালো করার প্রণালীকে নিয়ন্ত্রণ তো করেই, এমনকি তা বিপরীত দিকে চালনাও ক'রে। এ হল রঙ ফর্সা করার ক্রীম: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী!

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কিভাবে কাজ করে?

ত্বকের ভেতরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী, রঙ কালো করার প্রণালীকে বিপরীত দিকে চালনা ক'রে, ত্বকের ভেতরে স্নিগ্ধ-কোমল আর নিরাপদভাবে কাজ ক'রে আপনাকে এমন ফর্সা ক'রে যা নজরে পড়ে।

ত্বকের বাইরে: ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী-র বিশেষ 'রোদ-এড়ানোর-পর্দা', আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মিকে আটকে রঙ ময়লা হওয়া নিবারণ করে, অথচ আপনি সূর্যের যাবতীয় স্বাস্থ্যকর গুণ গ্রহণ করতে পারেন।

ফর্সা হবার জন্যে মাত্র ৬-সপ্তাহের কোর্স:

৬-সপ্তাহ নিয়মিত দিনে দুবার ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী মাখুন। প্রথমবার মাখার পর ত্বক হয়তো একটু চিন্‌চিন্ করতে পারে। এর মানে ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী কাজ করছে। ছ'সপ্তাহের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সবার নজরে পড়বেই। নিয়মিত ব্যবহার করুন—আর ফর্সা হয়ে থাকুন।

ফর্সা হওয়া বা ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী সম্বন্ধে আরো কিছু জানতে হলে, এর কাছে লিখুন:

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী অ্যাডভাইজার,
পোঃ অঃ বক্স নং ৭৫৮, বম্বে-৪০০ ০২১।

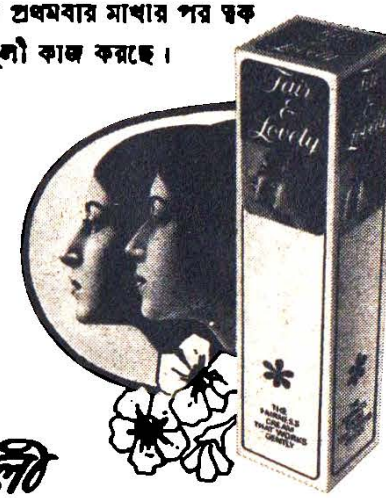

ফেয়ার অ্যাণ্ড লাভ্‌লী

রঙ ফর্সা করার ক্রীম

হিন্দুস্থান লিভারের
উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আপনাকে নজরে পড়ার মত ফর্সা করে··· প্রকৃতির নিজস্ব কোমল উপায়ে!

অন্যরকম ভূতের কথা পড়ে চমকে উঠল সে। গোরু মরে গেলেও যে ভূত হয়, তা কখনও শোনেনি। অবশ্য সব গোরুই যে ভূত হয়, তা নয়। যে-সব গোরু অপঘাতে মরে তারাই পরে গো-ভাগা বা গো-ভূত হয়ে যায়।

তো, এরকম একটা গো-ভাগার পাল্লায় পড়ল পাড়াগাঁর একটা লোক। যাচ্ছিল মেঠোপথ বেয়ে হনহন করে, দুপাশে ধানের খেত, মাঝখান দিয়ে বড়-বড় ঘাস মাড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একটা ইঁদুর দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। ইঁদুরটার গলায় একটা ঘন্টা বাঁধা, শব্দ হচ্ছে ঝুনঝুন। শুধু তাই নয়, তার চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। লোকটা বুঝতে পারল, এটা নিশ্চয় গো-ভাগা। আর বুঝতে পেরেই তার বুকের ভেতর রেলগাড়ি চলতে থাকল। গো-ভাগারা তো মাঠে-ঘাটেই ঘুরে বেড়ায় ইঁদুরের রূপ ধরে, আর এই ইঁদুর যদি কোনোরকমে একবার কোনো পথিকের দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারে, তাহলে মুখে রক্ত উঠে সে পথিকের মৃত্যু অনিবার্য।

লোকটা অসহায় হয়ে চারপাশে চাইল। ইঁদুরটা সামনে দিয়ে এলে তবু দু-পা জোড় করে তাকে ঠেকানো যেতে পারে। ইঁদুরটা কিন্তু সামনে দিয়ে এল না, ঝুনঝুন শব্দ করে পাশের ধানখেতে ঢুকে গেল। তখন লোকটা জোর কদমে হাঁটা শুরু করল, কিন্তু তাতেও রেহাই নেই, আবার ইঁদুরটার ঝুনঝুন শব্দ শোনা যায়। কাছেপিঠে কোথাও আছে, হয়তো বা অদৃশ্য হয়ে। একবার দুপায়ের ফাঁক দিয়ে গললে—

ভয়ে লোকটা দৌড় শুরু করে, মেঠোপথ ভেঙে দৌড়তে-দৌড়তে যখন সে হাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক সে-সময় পিছনে আবার ঝুনঝুন শব্দ। পিছন ফিরে দ্যাখে, ইঁদুরটা বেশ বড়সড় মনে হচ্ছে এবার, আর তার চোখদুটো যেন একটা গোরুর চোখের মতো জ্বলছে। বুঝতে পারল গো-ভাগাটা তার পিছু নিয়েছে, তাহলে আজ আর নিস্তার নেই। ভয়ে এবার সে ইঁদুরটাকে সামনে রেখে পিছনদিকে হাঁটতে শুরু করে। তক্ষুনি ইঁদুরটা অদৃশ্য হয়ে আবার তার পিছনে চলে গেল। এভাবে যতবার সে ইঁদুরটাকে সামনে রাখার জন্য ঘুরে দাঁড়ায় ইঁদুরটা ততবার ঘুরে তার পিছনে। ক্রমে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লোকটা ক্রমাগত বনবন করে চারপাশে ঘুরতে থাকল, আর তার মাঝখানে একবার ফুড়ুত করে ইঁদুরটা তার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে চলে গেল। ভয়ে, ক্লান্তিতে, পরিশ্রমে লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ল ধানখেতের মধ্যে।

এই পর্যন্ত পড়েই সন্টু একবার চারদিকে তাকাল। এতরকম ভূতের গল্প সে পড়েছে, কিন্তু গো-ভাগার নাম সে কখনও শোনেনি। পা-দুটো সামনের দিকে ছড়ানো ছিল তার, গা ছমছম করে উঠতেই সে-দুটো গুটিয়ে বসল। পথেঘাটে চলতে কত ইঁদুর তো তার চোখে পড়ে, এর মধ্যে কোন্‌টা যে গো-ভূত সে কী করে জানবে! তাদের বাগানেই কি কম ইঁদুর আছে। এই তো সেদিন চাটুজ্যেদের বাগানে একটা গোরু বাজ পড়ে সন্ধেবেলা মরে গেল। সেটাও নিশ্চয় গো-ভাগা হয়ে গেছে। বিল্টুদা এখনও এ-ব্যাপারটা জানে না। আজ বিকেলেই জানাতে হবে।

আবার পড়তে শুরু করল সন্টু। লোকটা শুধু মরেই গেল না। গো-ভাগা মানুষ মারলে সে-সব লোকরা একঠেঙে ভূত হয়ে যায়। লোকটা একঠেঙে ভূত হয়ে লম্বা তালগাছে বসে থাকে তার এক ঠ্যাঙ ঝুলিয়ে, তার নীচে দিয়ে যত লোক যায় তাদের লাথি মারে, মুখ থুবড়ে ফেলে দেয় আর হি-হি করে হাসে।

বাপ রে! সন্টুর গা'টা আবার ছমছম করে ওঠে। এ-সব ভূতের নাম আর

ব্যাপার-স্যাপার সে জন্মেও শোনেনি। সে আবার বসে আছে একটা তালগাছের গুঁড়ির কাছেই। বিল্টুদা পাশে থাকলে তার সাহস বেশি থাকে, আপাতত সে খুব নিরাপদ বোধ করল না। বইটা এখনও অনেক বাকি, ফেলে রেখে উঠতেও ইচ্ছে করছে না, এদিকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ ঘুম-ঘুমও পাচ্ছে। এখন, এই ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ঠাণ্ডা শানের মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে ঘুমনোই ভাল। ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ সে চমকে উঠল একটা ঝুনঝুন শব্দ শুনে। সর্বনাশ! গো-ভাগা নাকি! আর ঠিক তার পর মুহূর্তে তার মাথায় কে যেন পিছন থেকে ধাক্কা মারল। মাথাটা ঝিমঝিম করে চোখ অন্ধকার হয়ে এল তার, এ বোধহয় একঠেঙে ভূতের লাথি।

পিছনদিকে কোনোক্রমে ফিরে দেখল, একঠেঙে ভূত নয়, ধাক্কা মারছে বিল্টুদা।

চোখদুটো গোল-গোল করে বিল্টুদা বলছে, "কী রে, খুব যে জমিয়ে গল্পের বই পড়ছিস? এদিকে কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে বুনো আম পেকে উঠেছে, তার খবর রাখিস? একদম সিঁদুর-রঙ, চ' চ', পেড়ে আনি।"

সন্টু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বইটা গুঁজে রাখল কাঁঠালগাছের দুটো ঘন কাণ্ডের ভাঁজে, তারপর তরতর করে দুজনে ছুটল ওদের বিশাল বাগানের পরে একটা বিল পেরিয়ে যে ঘন জঙ্গল আছে সেদিকে। হায়! সন্টু যাবার আগে যদি একবারও বুঝতে পারত, যে-ভূতপেত্নিকে সে কখনও কেয়ার করে না, তাদের পাল্লায় এরপর নাস্তানাবুদ হতে হবে তাদের!

॥ ২ ॥

বিল্টু হল সন্টুর মাসতুতো ভাই। তবে 'চোরে চোরে' নয়, ওদের সবাই বলে 'জোড়ে জোড়ে মাসতুতো ভাই' কিংবা মানিকজোড়। দুজনে ভীষণ ভাব। বিল্টুদা তো ভীষণ সাহসী আর বেপরোয়া। ওর সঙ্গে মিশে সন্টুও এখন 'ডোন্ট-কেয়ার' হয়ে গেছে। চোর, পুলিশ, ডাকাত, খুনি, ভূত-পেত্নি কোনো কিছুতেই সে আর ভয় পায় না। অথচ তার মাত্তর এগারো বছর বয়স, আর বিল্টুদার চোদ্দ। মাঝে-মাঝে ঠিক দুক্কুরবেলা দুজনে পাড়ি দেয় গাঁয়ের দক্ষিণদিকে, জলাবিল পেরিয়ে কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে।

কড়াইমণ্ডির জঙ্গল এক অজানা রূপকথার দেশ। কতরকম আর রঙ-বেরঙের গাছগাছালি, লতাপাতা, ফলমূল পেকে বুঁদ হয়ে থাকে ডালে ডালে, গন্ধ ছড়ায়। কোথাও বুনোফুলের ঝাঁক ঘিরে মৌমাছি গুনগুন করে। আকাশছোঁয়া সেসব গাছের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাদের বিস্ময় আর কাটে না। ভরদুপুরেও তেমন রোদ্দুর পৌঁছতে পারে না জঙ্গলের ভিতর, তাই একটা আলো-আঁধারি ভাব। ডাঁশা কুল, বৈঁচি, কামরাঙা তো আছেই, তাছাড়া আমলকীর দু-তিনটে গাছ ওদের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

পাক্কা আধঘণ্টা পরে বিল পেরিয়ে ওরা ঢুকে পড়ল কড়াইমণ্ডির অসাড় জঙ্গলে। শীতের দুপুর বলে রোদের হাঁপ অনেকটা কম, এরকম দুপুরে টইটই করে ঘুরে বেড়াতে ভালই লাগে।

চলতে চলতে বিল্টুদা পকেট থেকে একমুঠো খোসা-ছাড়ানো বাদাম সন্টুর হাতে দিল, "নে, চিবো।"

খোসা ছাড়িয়ে নুন আর শুকনো লঙ্কা দিয়ে তেল-চুবচুবে ভাজা বাদাম। গালে ফেলতেই সন্টু জিবে স্বর্গসুখ অনুভব করল। এজন্যই বিল্টুদাকে তার এত ভাল লাগে।

কড়াইমণ্ডির জঙ্গল বেশ বড়ই। কত বড় তা সন্টুর ধারণা নেই। জঙ্গলের গভীরে কখনও যায়নি। আজ হঠাৎ সাহস করে দুজনে অনেক ভিতরে ঢুকে গেল। জঙ্গল

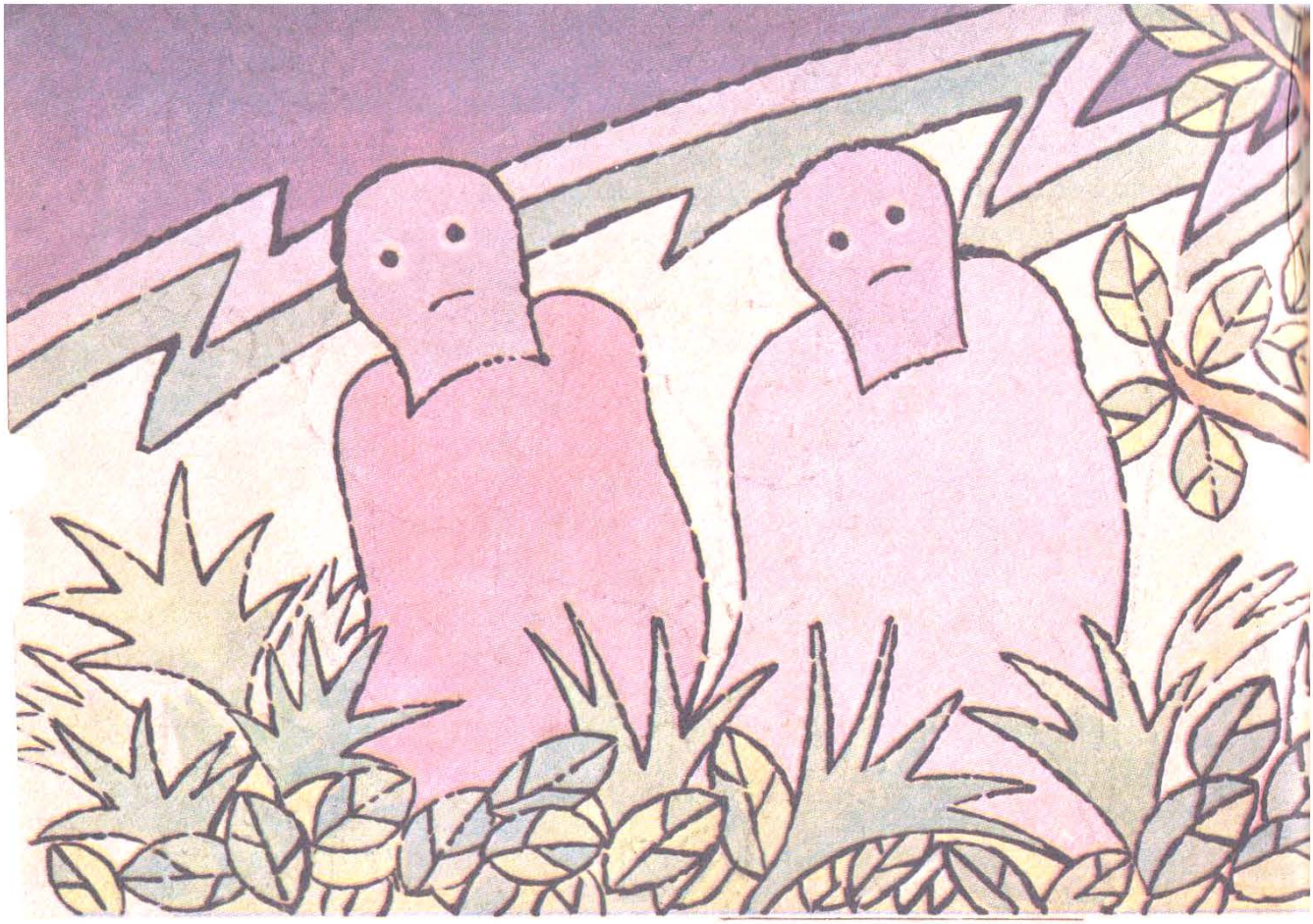

ক্রমশ এত ঘন আর গভীর হয়ে গেছে যে, সূর্যের আলো ভিতরে প্রায় আসে না বললেই চলে। এই ভরদুপুরেও আলো-আঁধারি ভাব কোথাও প্রায় ঘুরঘুট্টি। একটা লাল-হলদে পাখি ক্রমাগত এ-ডাল ও-ডাল করে ওদের অনেকটা ভিতরে নিয়ে গেল। বিল্টুদা যতবার গুলতি তাক করে, ততবারই পাখিটা টুক করে অন্য ডালে উড়ে বসে।

এভাবে ডালপালা লতাপাতা সরিয়ে কিছুটা যাবার পর একটা ছোট খাল চোখে পড়ল ওদের। তরতরে জল, কুলকুল করে বয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সবুজ ডাল দুপাশে ঝুঁকে পড়েছে জলের মধ্যে। দুজনেই খুব আশ্চর্য হল। এখানে কোনো খাল আছে বলে জানত না ওরা, খালের পাড় দিয়ে সরু রাস্তা বনের ভিতর মিলিয়ে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজনেই সম্বিত হারিয়ে ফেলেছিল, খেয়াল হতে বুঝল, শীতের বেলা, জঙ্গলের ওপাশে সূর্যদেব প্রায় ডুবু-ডুবু, চারপাশে ক্রমে ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার। সন্টু বলে উঠল, "চলো বিল্টুদা, এবার বাড়ির দিকে ফেরা যাক। সন্ধে হয়ে আসছে।"

কিন্তু ফিরতে চাইলেই কি ফেরা যায়। এলোমেলোভাবে চলতে চলতে তারা যে কতদূর সেঁধিয়ে এসেছে বনের ভিতর, তা দুজনের কেউই অনুমান করতে পারল না। পিছন ফিরে দেখে, লতাপাতা কাণ্ডের আড়ালে কেবল জঙ্গল আর জঙ্গল। ঝোপঝাড় ঠেলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কোথাও বনের সেই সরু পথ দেখতে পেল না ওরা। বরং একটু পরে ঘুরেফিরে সেই খালের পাড়ে এসে পৌঁছল। সন্টু ভয় পেয়ে বলে উঠল, "কী হবে বিল্টুদা।"

বিল্টুদা জবাব না দিয়ে দূরে আঙুল দিয়ে কী একটা দেখাল। তার আঙুল অনুসরণ করে সন্টু দেখল, জঙ্গলের ভিতর একটা বিশাল বাড়ি। পুরনো জমিদার-বাড়ির মতো চেহারা, তিনতলা তো বটেই, চারতলাও

হতে পারে। প্রায় দু-তিন বিঘে জায়গা নিয়ে বাড়িটার এলাকা, চারপাশে উঁচু পাঁচিল। কড়াইমণ্ডির জঙ্গলের সব ইতিহাস তারা জানে না। এই জঙ্গল থেকে একদিন বৈঁচিফল এনেছিল বলে সন্টুর মা খুব বকাবকি করে বলেছিলেন, "তোদের সাহস তো বলিহারি, অমন জঙ্গলে কি ঢুকতে আছে? চোর-ডাকাত, সাপ-খোপ, ভূত-প্রেত কতকিছু থাকতে পারে। রাত্তিরে নাকি জঙ্গলের ভিতর আলো জ্বলে।" তো, এসব কথা ওরা ভয়-দেখানো কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। এমন একটা পোড়োবাড়িতে যে ডাকাতদের আস্তানা থাকতে পারে, তা এখন আর ওরা অস্বীকার করতে পারল না।

কিন্তু ডাকাত নয়, একটু পরে যা দেখল, তাতে মুহূর্তে দুজনের বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। দেখে, দুটো কালো মুখ-ঢাকা আলখাল্লা-পরা মূর্তি বড় বাড়িটার দিক থেকে লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙ বাড়িয়ে ওদের দিকে আসছে। মূর্তি না বলে ছায়ামূর্তি বলাই ভাল। বিল্টুদা চট করে সন্টুর হাত ধরে হড় হড় করে টেনে একটা বড় গাছের আড়ালে নিয়ে গেল। ছায়ামূর্তি দুটো সোজা এসে দাঁড়াল খালের পাড়ে, ওদের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় কেমন একটা ঠকঠক শব্দ শুনতে পেয়েছিল। শব্দটার রহস্য বুঝতে পারল যখন ছায়ামূর্তিদুটো তাদের গায়ের আলখাল্লাদুটো খুলে একটা পাকুড় গাছের গোড়ায় রাখল। স্রেফ দুটো কংকাল। আলখাল্লা খুলে রেখে কংকালদুটো মুহূর্তে মিলিয়ে গেল জলের মধ্যে।

দৃশ্যটা দেখে দুজনের বুকের মধ্যেই ঢিব-ঢিব শব্দ হচ্ছিল। এই মুহূর্তে এখান থেকে পালানো দরকার, কিন্তু কীভাবে পালাবে বুঝতে পারার আগেই কানে এল আবার হাড়-ঠকঠক শব্দ। এবার লুকোতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে, কারণ, আরো একটা ছায়ামূর্তি ওদের গাছটার দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি বার

করল বিল্টুদা। পাকুড়গাছের গোড়া থেকে মুখঢাকা আলখাল্লাদুটো তুলে নিয়ে নিজে একটা পরে ফেলল, অন্যটা পরিয়ে দিল সন্টুকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তিটা ওদের কাছে এসে দাঁড়াল।

॥ ৩ ॥

ছায়ামূর্তিটা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ বলল, "তোরা কেঁ রে, তোঁদের তো এঁ-পাড়ায়, কঁখনো দেঁখিনি।"

সন্টুর বুকের ভিতরে এমন রেলগাড়ি চলতে শুরু করল যে ওর মনে হল, এক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। আলখাল্লার ভিতরে গলগল করে ঘামছে সে, চোখের কাছে একটা জাল-লাগান বলে তার ভিতর দিয়ে ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পাচ্ছে ওরা। এতদিন ভূতপেত্নি নিয়ে এতসব গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা আর ডোন্ট-কেয়ার ভাব কোথায় মিলিয়ে গেল লহমায়। সন্টু আর কিছু ভাবার আগেই বিল্টুদা হঠাৎ আলখাল্লার ভেতর দিয়ে বলে উঠল, "আমঁরা আঁগে গাঁয়ে থাঁকতাম, ওঁখানে ভাঁল লাঁগছে না। তাই জঁঙ্গলে চঁলে এঁলাম তোঁমাদের সঁঙ্গে থাঁকব বঁলে।"

হি-হি করে হেসে উঠল ছায়ামূর্তি, হাড়গুলো ঠকঠক করে উঠল অন্ধকারে। আলখাল্লার ভিতর থেকে তার হাসিটা এমন কলকল করে ক্রমাগত বেরুতে থাকল যে, পিলে-চমকে-ওঠা কাকে বলে টের পেল সন্টু। "তাঁ বেঁশ কঁরেছিস, চঁল্ আঁগে আঁমাদের আঁস্তানায় নিয়ে যাঁই।"

ছায়ামূর্তির হাসি শুনে সন্টু বুঝতে পারল, ওরা ধরা পড়ে গেছে। এরপর ওদের অবস্থা যে কী হবে, তা মানসচক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেল। ছায়ামূর্তি আগে আগে চলতে শুরু করতেই বিল্টুদা সন্টুকে ইশারা করল অনুসরণ করতে। সর্বনাশ! ওই পোড়োবাড়িটার দিকেই যে যাচ্ছে ওরা।

খুব লম্বা-লম্বা পা ফেলছে ছায়ামূর্তিটা, মাঝে-মাঝে পা যেন মাটি না ছুঁয়েই চলে যাচ্ছে। আর সমস্ত শরীরটা হাওয়ায় হালকা হয়ে ভাসছে বলে মনে হল। এহেন ভূতের সঙ্গে ওরা দুজনে হেঁটে আর পারে না, তাই ছুটছে দুজনে। মিনিট-পনেরো পরে এসে পৌঁছল সেই পোড়োবাড়ির কাছে।

বাড়িটা বহু বছরের পুরনো, পাতলা ইঁটের তৈরি, চুন-সুরকি দিয়ে গাঁথা। পলেস্তারা খসে-খসে এখন সব জায়গায় হাড়-জিরজিরে কংকালের মতো চেহারা হয়েছে, যেন দাঁত বের করে হাসছে হি-হি করে। ভূতদের থাকার মতো প্রকৃষ্ট জায়গাই বটে। তিনতলা বাড়ি হলেও দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশাল। আগে রাজবাড়ি কিংবা সম্ভ্রান্ত জমিদারবাড়ি ছিল বলে মনে হয়।

ছায়ামূর্তির পিছু-পিছু বড়-বড় সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এসে দেখল এখানে-ওখানে আরো অনেক ছায়ামূর্তি ঘুরছে-ফিরছে। একজন বারান্দার কোণে হেলান দিয়ে রয়েছে থামের সঙ্গে, দুজন নাকিসুরে গুজগুজ করছে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে। একজন বারান্দার কুলুঙ্গিতে গুটিসুটি মেরে বসে আছে পায়ের সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে, অন্য একজন ছেঁড়াখোঁড়া সোফাটায় শরীর রেখে পা দুটো তুলে ধরেছে দেওয়ালের উপর। প্রত্যেকেরই শরীর কালো আলখাল্লায় ঢাকা।

যে-ছায়ামূর্তির পিছু-পিছু ওরা আসছিল সেটা হঠাৎ সাঁত করে দেওয়ালের ভিতর দিয়ে মিলিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। ব্যাপার বুঝে ফাঁপরে পড়ল ওরা, ভূতের মতো দেয়াল ভেদ করে তো ওরা আর ভিতরে যেতে পারবে না। বিল্টুদা পট্ করে বুদ্ধি খাটিয়ে পাশের ভাঙা দরজার মধ্য দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল সন্টুকে নিয়ে। ছায়ামূর্তিটা ততক্ষণে সে-ঘর পেরিয়ে বোধহয় অনেকটা চলে গিয়েছিল, সন্টুদের না দেখতে পেয়ে আবার সাঁত করে ফিরে এল ঘরে। বলল,

"কী ব্যাপার, তোরা এত দেরি করছিস কেন? চল্, রানীর দরবারে নিয়ে যাই তোদের।"

রানীর দরবারে যেতে হবে কেন? শুনেই ওদের বুকটা ছাঁত করে উঠল। ছায়ামূর্তিটার কী মতলব বোঝা যাচ্ছে না। এ-দরজা, ও-দরজা, বারান্দার পর বারান্দা পেরিয়ে যেতে লাগল ওরা। পাশ দিয়ে সাঁ-সাঁ করে আরো অনেক ছায়ামূর্তি চলে যাচ্ছে, একবার একটা হাওয়া এসে হঠাৎ দুজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল, বোধহয় এ-ভূতটা অদৃশ্য। আলখাল্লার ভিতর দিয়ে বিল্টুদা আর সন্টু চোখাচোখি করল এক লহমা।

খানিকক্ষণ পরে ওরা এসে পৌঁছল একটা বিশাল হলঘরের মধ্যে। এ-ঘরটার ঘুলঘুলি দিয়ে একটা জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না আলো আসছে, তাই রাত হলেও ঘরের ছবিটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সন্টুরা। একদিকে ভাঙা চেয়ার-টেবিল পাতা, চেয়ারে বসে আছে নীল আলখাল্লায় ঢাকা এক ছায়ামূর্তি। লালরঙের পালক সাঁটা রয়েছে আলখাল্লার গায়ে, তাতে ছায়ামূর্তিটাকে বেশ জমকালো দেখাচ্ছিল। তার সামনে ঘরের মেঝেয় বসে আছে আরো তিরিশ-চল্লিশটা ছায়ামূর্তি। সবাই নাকিসুরে কিচমিচ করে কী-সব জিজ্ঞাসা করছে চেয়ারে-বসা ছায়ামূর্তিটাকে আর সে একইরকমভাবে নাকিগলায় তার উত্তর দিচ্ছে, হাত-পা নেড়ে বোঝাচ্ছে তাদের।

যে-ছায়ামূর্তিটা সন্টুদের এখানে নিয়ে এসেছে, সে সোজা চেয়ারে-বসা ছায়ামূর্তির কাছে গিয়ে নিজের একটা পা কপালে ছুঁইয়ে বলল, "রানী মিং মিং, এই পোঁ-ভূতদুটো জঙ্গলে ঘুরঘুর করছিল, আপনার রাজত্বে থাকতে চায়, তাই নিয়ে এলাম।"

তাহলে এই হল রানী, তাই অত লাল পালকের ছড়াছড়ি তার আলখাল্লায়। রানী মিং-মিং বলল, "তা বেশ বেশ। কি নাম তোদের?"

সন্টুর বুকটা হিম হয়ে গেল। কী উত্তর দেবে এখন। নাম না বলতে পারলে এরা ব্যাপারটা নির্ঘাত বুঝে যাবে, আর অমনি ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খেয়ে নেবে। ভয়ে নীল হয়ে সে বিল্টুদার দিকে তাকাল, আর তক্ষুনি বিল্টুদা হাতদুটো ক্যাঙারুগোছের করে কুঁই কুঁই শব্দ করল গলায়। দেখাদেখি সন্টু একই ভঙ্গিতে "উঁ-উঁ" শব্দ করে দেখল।

রানী কী বুঝল কে জানে! দেয়ালে অনেকগুলো চক্কর-বক্কর দাগ কাটা ছিল, হাত লম্বা করে তার পাশে আরো দুটো দাগ কেটে বলল, "যা, বোস এখেনে।" সন্টু বুঝতে পারল, চক্কর-বক্কর দাগগুলো ভূতদের নাম, ওই তালিকায় তাদের নাম যুক্ত হল।

ওরা বসতেই শুরু হল রানী মিং মিং-এর বিচারসভা।

॥ ৪ ॥

ভূতদেরও যে রানীটানি থাকে, তা সন্টুদের জানা ছিল না। রানী মিং মিং ভূতদের নিয়ে দিব্যি রাজত্ব চালাচ্ছে। 'ভূতের রাজত্ব' কথাটা মনে আসতেই সন্টু প্রায় খিক খিক করে হেসে ফেলেছিল, কিন্তু হেসে ফেললেই যে অবধারিত মৃত্যু তা মনে পড়তেই সামলে নিল নিজেকে। ইতিমধ্যে বিল্টুদা তার গায়ে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, এখন বেশ কিছুক্ষণ তাদের এরকম ভূত সেজে থাকতে হবে।

একটু বাদে রানী মিং-মিং-এর বিচারসভা শুরু হল। সন্টু আর বিল্টুদা আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল অন্যান্য ভূতদের মাঝখানে। রানী মিং মিং-এর হাতে এখন একটা লাল-নীল বল, সেটা হঠাৎ উপরে ছুঁড়ে দিতেই ছাদে লেগে টং করে একটা শব্দ হল। সন্টু দেখল ছাতের ওই জায়গাটায় একটা ঘন্টা বাঁধা আছে। শব্দ হতেই কালো

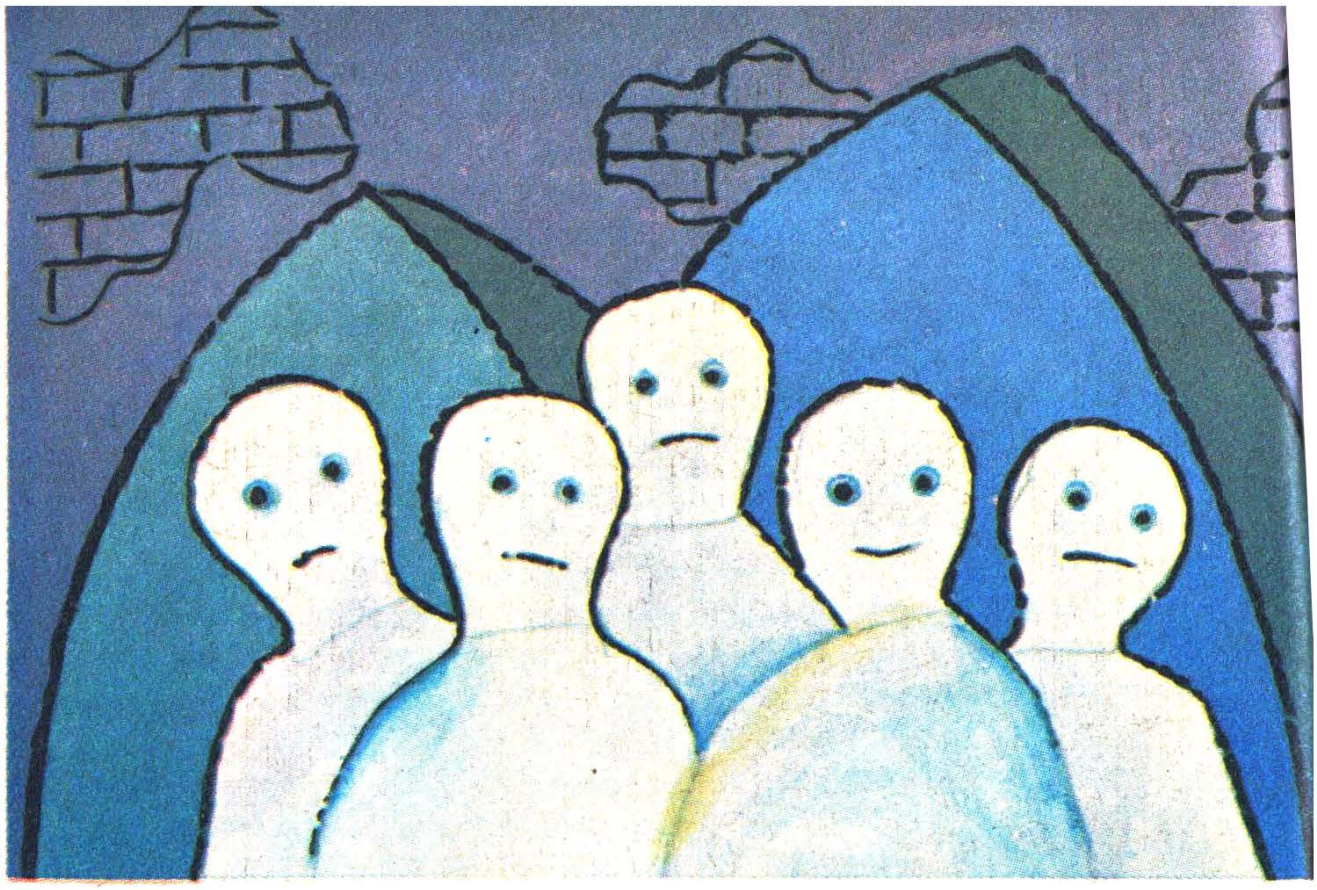

আলখাল্লা পরা একটা ভূত দাঁড়িয়ে উঠে নাকিসুরে জানাল, কালাদিঘির পাড়ের বিশাল তালগাছটায় সে আজ প্রায় দশবছর হল আছে, কিন্তু সরকার-বাড়ির বুড়ো চাকরটা মরে ভূত হয়ে এসে দাবি করছে, এ তালগাছ তার মনিবের, তাই এর ওপরে সে-ই থাকবে। এই অন্যায়ের বিচার চাই।

রানী তৎক্ষণাৎ তার পাশে দাঁড়ানো একজন সেপাইগোছের ভূতকে বলল, "এক্ষুনি চাকর-ভূতটাকে বিচারসভায় নিয়ে এসো।"

আর একজন জানাল, বেঁচে থাকতে বুড়ি-বৌ তার সঙ্গে রাতদিন ঝগড়া করত, মরে গিয়ে বুড়ির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু মাসখানেক আগে বুড়ি মরে গিয়ে তাকে আবার ধাওয়া করেছে। যে-আমগাছে সে থাকত, তক্কে-তক্কে বুড়ি হাজির হয়েছে সেখানে, আর ফের গাল পাড়ছে আগের মতো। রানী কিছু বলার আগেই বুড়ো ভূতটার পাশ থেকে উঠল ছোটখাটো চেহারার একটা ছায়ামূর্তি। খ্যানখেনে গলায় চিৎকার করে বলতে লাগল, "কক্ষনো না। বুড়ো নিজেই অকর্মার ঢেঁকি, কুটোগাছটা নাড়বে না, কুঁড়ের বাদশা।"

বুড়ো ভূত কী একটা বলে ফেলেছে, অমনি তার বুড়ি পেত্নি "তবে রে বুড়ো" বলে ধাওয়া করতেই বুড়ো সাঁ করে পালিয়ে গেল বিচারসভা থেকে, পিছন-পিছন বুড়িও ছুটল তার আলখাল্লা সামলাতে-সামলাতে।

সন্টু ব্যাপার-স্যাপার দেখে আবার হেসে উঠতে যাচ্ছিল, বিল্টুদার কনুইয়ের খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেল। আর একজন ঢ্যাঙা চেহারার ভূত নাকি গলায় বলতে শুরু করল।

ঠিক এমনি সময় দুটো কংকাল তাদের হাড় ঠক-ঠক করতে-করতে হলঘরে ঢুকে পড়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল। কিছুক্ষণ

পরে বোঝা গেল, তারা আলখাল্লা দুটো পাকুড়গাছের নীচে খুলে রেখেছিল। খালের জলে একটু গা ডুবিয়ে নেবার পরে উপরে এসে আর তাদের আলখাল্লা দুটো খুঁজে পাচ্ছে না। নিশ্চয় কেউ চুরি করেছে। এদিকে বেজায় শীত ধরে গেছে তাদের।

সন্টুর বুকের ভিতরটা হিম হয়ে গেল, সে আর বিল্টুদাই তো ওদের পোশাক দুটো চুরি করে পরেছে। আর তাই তো এইসব ভূতদের মধ্যে দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে তখন থেকে। এখন যদি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়, তাহলে নির্ঘাত ধরা পড়ে যাবে ওরা। সন্টুর বুকের স্পন্দন এক মুহূর্তের জন্য থেমে গেল।

রানী কাঁসরঘন্টা বাজবার মতো শব্দ করে খ্যানখ্যানে গলায় বকাবকি করল অনেকক্ষণ, তারপর সেপাইগোছের একজনকে বলল, আরো দুটো পোশাক হাফেজখানা থেকে ওদের দিয়ে দিতে।

যে ছায়ামূর্তিটা বিল্টুদা আর সন্টুকে বনের ভিতর থেকে ধরে এনে এই ভূতের রাজ্যে নিয়ে এসেছে, তার নাম হুঁ-পু। রানী কিছুক্ষণ পরেই সভা ভেঙে দিতে হুঁ-পু বলল, "উঁ-উঁ আর কুঁই-কুঁই, চল্, এবার খেতে যেতে হবে।"

সন্টু বিল্টুদার দিকে তাকাল একবার। অনেকক্ষণ থেকে খিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছে, এবার কিছু পেটে পড়বে জেনে নিশ্চিন্ত হল।

হুঁ-পু একটা গোলপানা ঘরে নিয়ে গেল ওদের। ঘরটা অন্ধকার, পোড়া-গন্ধ চারদিকে, ফাটাফুটা মেঝে। একে-একে ছায়ামূর্তিগুলো ঘরের ভিতর ঢুকে গোল হয়ে বসে পড়ল। সন্টু আর বিল্টুদাকে নিয়ে হুঁ-পু তার মধ্যে ভিড়ে গেল খাওয়ার জন্যে। নাকিসুরের কিচমিচ শব্দে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়, তার মধ্যে ফুরফুরে চেহারার এক ছায়ামূর্তি ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের সামনে একটা করে পাত্র রেখে

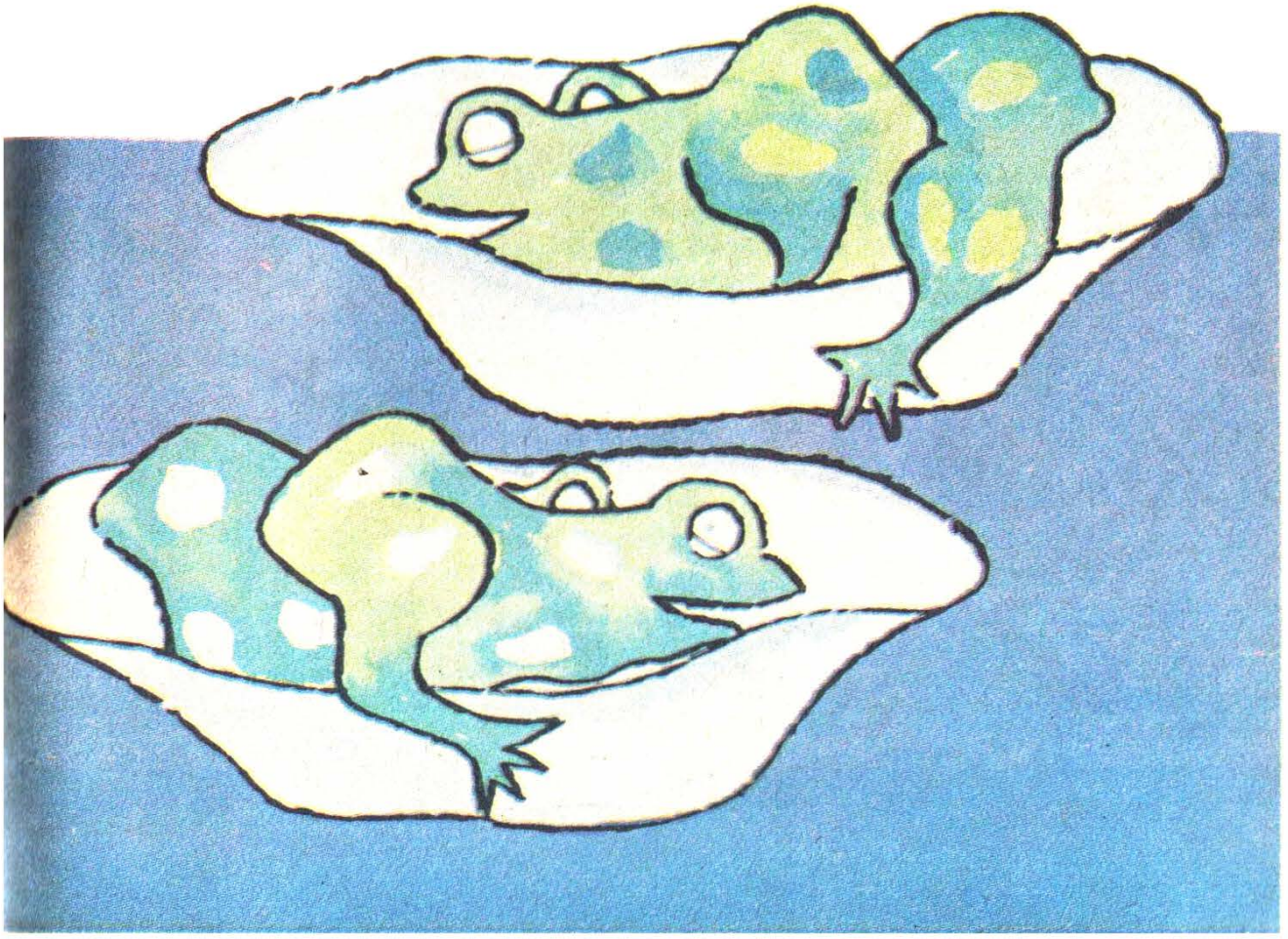

গেল। তার মধ্যে খাবার রাখা। খাবারের চেহারা দেখে সন্টুর কান্না পেয়ে গেল। বিটকেল গন্ধওলা এগুলো কী খাবার। গন্ধে তো বমি এসে যাচ্ছে।

পাত্রের ভিতরে দুটো করে বড় সাইজের ব্যাঙ। ছায়ামূর্তিগুলো সেই ব্যাঙ মহানন্দে চিবোচ্ছে। কিন্তু সন্টুরা সেগুলো না পারছে খেতে, না পারছে ফেলে রাখতে। হঠাৎ বিল্টুদা চট্ করে বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যাঙদুটো চুপিচুপি তার আলখাল্লার পকেটে চালান করে দিয়ে মুখ নাড়তে লাগল। দেখাদেখি সন্টুও তাই করল।

কিন্তু এতেও রেহাই নেই। এরপর সেই ছায়ামূর্তি এসে আর একটা করে পাত্র রেখে গেল প্রত্যেকের সামনে। তাতে রয়েছে বড়-বড় মরা গিরগিটি আর শকুনের ডিম। বিল্টুদার মতো সন্টুর আলখাল্লার পকেটও ভারী হয়ে উঠল। সবার খাওয়া শেষ হতে হুঁ-পুর সঙ্গে ওরা বাইরে বেরিয়ে এল। পর-পর কয়েকটা অন্ধকার ঘর পেরিয়ে হুঁ-পু ওদের বাইরে নিয়ে এল। এসে বুক ভরে পরিষ্কার বাতাস নিয়ে শুদ্ধ হল যেন শরীরটা।

হুঁ-পু এবার বলল, "চল, এবার তোদের একটা পেট-ঘুলঘুল-করা দৃশ্য দেখাই।"

॥ ৫ ॥

হুঁ-পুর সঙ্গে সন্টুরা যেখানে পৌঁছল, তা ওদের খুব চেনা জায়গা। যে-সিঁদুরকৌটো আম গাছের ডালে তারা অনেকবার চড়েছে, তার পাশে যে দত্যির মতো বটগাছ, তার নীচেই নাকি বাবা ভোম-ভোম উদয় হবেন। আরো অনেকগুলো ছায়ামূর্তি আগেই পৌঁছেছে সেখানে, কেউ-কেউ বট গাছের ডালে লম্বা-লম্বা পা ঝুলিয়ে বসে আছে, কেউবা ডালে হাঁটু ভাঁজ করে শরীরটাকে ঝুলিয়ে দিয়েছে, কেউ বা ঝুরিতে ঝুলছে। সন্টুদা বটগাছের গুঁড়ির ওপর জম্পেশ করে

শোকার্ত কলকাতা
শোকার্ত পশ্চিমবঙ্গ

কেউ যদি প্রশ্ন করে 'কলকাতা শহরটা কার' ?
তবে তার উত্তর হবে 'যে ভালবাসে তার'।

হ্যাঁ ! কলকাতাকে যে ভালবাসে কলকাতা যেন তারই হয়ে যায়। সেই জন্যেই "আমাদের কলকাতা", "হামারা কলকততা"-র মত নানান বুলি শোনা যায়। কলকাতা যেমন উদার মনে নানা ভাষাভাষী লোককে তার কোলে আশ্রয় দিয়েছে বিভেদ ভুলে, তেমনি তারাও কলকাতাকে ভালবেসেছেন অকুণ্ঠভাবে।

এমনি এক কলকাতা প্রেমিক নাগরিক ছিলেন শ্রী এম· জি· কুট্টি। সি· এম· ডি· এ-র চীফ একসিকিউটিভ অফিসার শ্রী কুট্টি গত ১৩ই জুলাই তাঁর অফিসে বসে কাজ করতে করতে হঠাৎ মারা গেলেন হৃদরোগে। শহরের উন্নয়নের জন্য তিনি সি এম পি ও, কলকাতা কর্পোরেশন ও ও সি এম ডি এ-তে থেকে যে সব ভাল ভাল কাজ করে গেছেন তার কোন তুলনা হয় না। এই কাজের পিছনে ছিল তাঁর সুগভীর কলকাতা প্রীতি। সম্প্রতি তিনি যে ব্যাপারে খুব বেশী মনোযোগ দিচ্ছিলেন, তা হল, জমির সদ্ব্যবহার। কলকাতা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে, কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছিলেন, ভবিষ্যতের কলকাতা যেন একটু সু-পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠে। এজন্যই তাঁর চিন্তা। সি, এম, ডি, এ তাঁর আরম্ভ করা কাজ কতখানি সফল করতে পারবে, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের বড় একটা ক্ষতি হল। আর জান, অতবড় একজন আই এ এস অফিসার পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতাকে এত ভালবেসেছিলেন যে কথা বলার সময়েও পারতপক্ষে তিনি বাংলাভাষাতেই কথা বলতেন। তাঁর মৃত্যুতে শুধু কলকাতাই নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গ শোকার্ত !

জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ, ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-১৭ থেকে প্রচারিত

বসল। মামদো-ভূত আসবে শুনে আজ এই ভূত-সমাগম, একটু পরে রানী মিং-মিংও নাকি আসবে।

মামদো-ভূতটা নাকি ময়ালসাপের বিষ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে ছ-মাস, তারপর ঘুম ভেঙে সে কিছুক্ষণ হৈ-হুল্লোড় করে ভূতদের সঙ্গে, তারপর আবার সাপের বিষ খেয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে বটগাছের কাণ্ড কিংবা শুঁড়ির ভিতর।

মামদো-ভূত নামটাই ভয়ের, তার উপর যার নাম ভোম-ভোম, সে না জানি কীরকম চেহারার! হুঁ-পু জানাল, মানুষ মরে যেমন ভূত হয়ে যায়, তেমনি ভূত মরে গেলে হয় মামদো-ভূত। তবে এক-আধটা ভূত নয়, একশো ভূত মরলে তবে একটা মামদো-ভূত হয়।

হঠাৎ মড়মড় করে উঠল বটগাছের ডালপালা, আর সন্টুরা যেখানে বসে ছিল, সেই শুঁড়ির কৌকড়ানো ঝুরিগুলো উলটে-পালটে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। আর একটু হলেই সন্টু পড়ে যাচ্ছিল আর কি। শুঁড়ির ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল জায়গাটা। ক্রমশ ধোঁয়াটা ভীষণ হয়ে উঠল। পুঞ্জীভূত মেঘের মতো ঘন ও পুরু তার শরীর, একটু পরে বিশাল ভালুকের মতো চেহারা ধারণ করল সে।

কালো ভালুকের মতো চেহারাটা এবার গমগম শব্দ করে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। শব্দটা শুনে মনে হল মামদো-ভূতটা হাসছে, হাসির দমকে কাঁপছে তার শরীরটা, অথচ হাসির শব্দটা মেঘের গর্জনের মতো ভীষণ শোনাল সন্টুদের কানে।

হাসির মধ্যে ফের গমগমিয়ে উঠল শব্দ : হাঃ হাঃ হাঃ, সব রম্বি (কুশল) তো? অনেকদিন টাম্বু (খোঁজ-খবর) পাইনি। রানী মিং-মিং রিমনি (সুস্থ) আছে তো?

কী অদ্ভুত সব ভাষা! হুঁ-পু সন্টুদের কথাগুলোর মানে বুঝিয়ে দিতে লাগল।

ভালুকের মতো চেহারার মামদো-ভূতটা ক্রমাগত চেহারা বদলে ফেলছিল। এবার হা-হা করে হাসতেই তার চেহারা আবার অন্যরকম হয়ে গেল। বলল, "কত রুম্বায় (জায়গায়) গেছি, একটা হাতির নাকের ভিতর বেশ জুগনায় (মজায়) ছিলাম, দুটো মেঝের ভিতর দুমাস, একটা পুকুরে ক-দিন, তাছাড়া সমুদ্দুরের ঢেউ হয়ে ক-মাস বেশ কেটেছে। বাকিসময় এই বটগাছের শুঁড়িতে।"

"বেশ বেশ মামা ভোম-ভোম। এবার তোমার কী চাই বলো।" এক ছায়ামূর্তি জিজ্ঞেস করল।

মামদো ভূত শরীরটাকে ওলটাল-পালটাল, তারপর বলল, "তাজা দু-একটা রসনি (কচি ছেলে) যোগাড় কর, আর একডাণ্ডি (পাত্র) বরফ-জুড়নো বাতাস। নিজের হাতে রসনির ঘাড় মটকে রক্ত চুষব আর ওই ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে মৌতাত করব। যা জমবে না। হঃ হঃ হঃ।"

"ওহ্ মামা!" সেই ছায়ামূর্তিটা যেন হেঁচকি তুলল, "এবার জব্বর অর্ডার দিয়েছ মামা। যোগাড় করতে আমার কালঘাম ছুটে যাবে। ঠিক আছে, দুদিন সময় চাই। তবে একটা শর্ত আছে, রসনি নিয়ে এলে আমাকে মামদো-ভূত করে দেবে তো, মামা ভোম-ভোম।"

আবার সেই ভীষণ মেঘের গর্জন, আর কালো পুঞ্জীভূত বিশাল চেহারার ওলট-পালট। হঠাৎ কোত্থেকে একটা ছোটখাটো চেহারার লিকলিকে ছায়ামূর্তি এসে মামার ধোঁয়াটে শরীরের কাছে গিয়ে আদুরে অথচ খ্যানখ্যানে গলায় টেনে টেনে বলল, "তোমার ঘুম ভে-এ-ঙে-ছে মামা ভো-ওম-ভোম? কঁ-অখন ভাঙল! আমি তো জানতে-ই পারিনি।"

আবার বিকট হাসি, কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল সেই মেঘ, "তুই সেই মিউ-মিউ না ? হাঃ হাঃ হাঃ আমি তো ভাবছিলাম তুই অ্যাদ্দিনে শাঁকচুন্নি হয়ে গেছিস ?"

সন্টু এই পেত্নিটাকে কিছুক্ষণ আগে চৌধুরীদের বাগানে বসে থাকতে দেখেছিল। মিউ-মিউ বলল, "মামা, তুমি না বলেছিলে আমাকে মামদো-পেত্নি করে দেবে।"

আবার সেই মেঘের বিকট শব্দ— "হাঃ হাঃ হাঃ, তোর আবার মামদো-পেত্নি হবার শখ। হাঃ হাঃ হাঃ।"

খুব অপমানিত বোধ করল মিউ-মিউ। তারপর লম্বা পা বাড়িয়ে একটা বড় পাকুড় গাছের মগডালে একলাফে উঠে চুপ করে বসে রইল। ভঙ্গিটা দেখে খুব মজা পেল ওরা। কিন্তু এরপরেই ঘটল অন্যরকম ঘটনা। হঠাৎ মামদো-ভূতটা কিসের যেন গন্ধ পেয়ে দোমড়াতে লাগল তার শরীর, তারপর গমগমে গলায় বলল, "এখানে কি কোনো রসনি (কচি ছেলে) আছে, গন্ধ ভুরভুর করছে যে।"

শুনে সন্টু আর বিল্টুদার বুকটা একসঙ্গে ছ্যাঁত করে উঠল, দুজনে মুখঢাকা আলখাল্লার ভিতর দিয়ে চোখাচোখি করল একবার। হুঁ-পু বলল, "না না মামা, তোমার ঠাহরে ভুল হয়েছে। এখানে তো কেউ নেই। বোধহয় তোমার জব্বর খিদে পেয়েছে।"

মেঘের গর্জনে ফের চমকে ওঠে সবাই—"নান্-না, বেশ রসনি রক্তের তাজা গন্ধ পাচ্ছি, ইচ্ছে করছে কচকচ করে মুণ্ডুটা চিবিয়ে খাই।"

বিল্টুদা আর সন্টুর বুকের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সর্বনাশ ! তারা কি এবার ধরা পড়ে যাবে ? সন্টু ভয় পেয়ে রাম-নাম জপ করতে লাগল, হয়তো তাদের শেষ সময় উপস্থিত।

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল সেখানে। মিউ-মিউ যে পাকুড়গাছটার ওপরে বসে

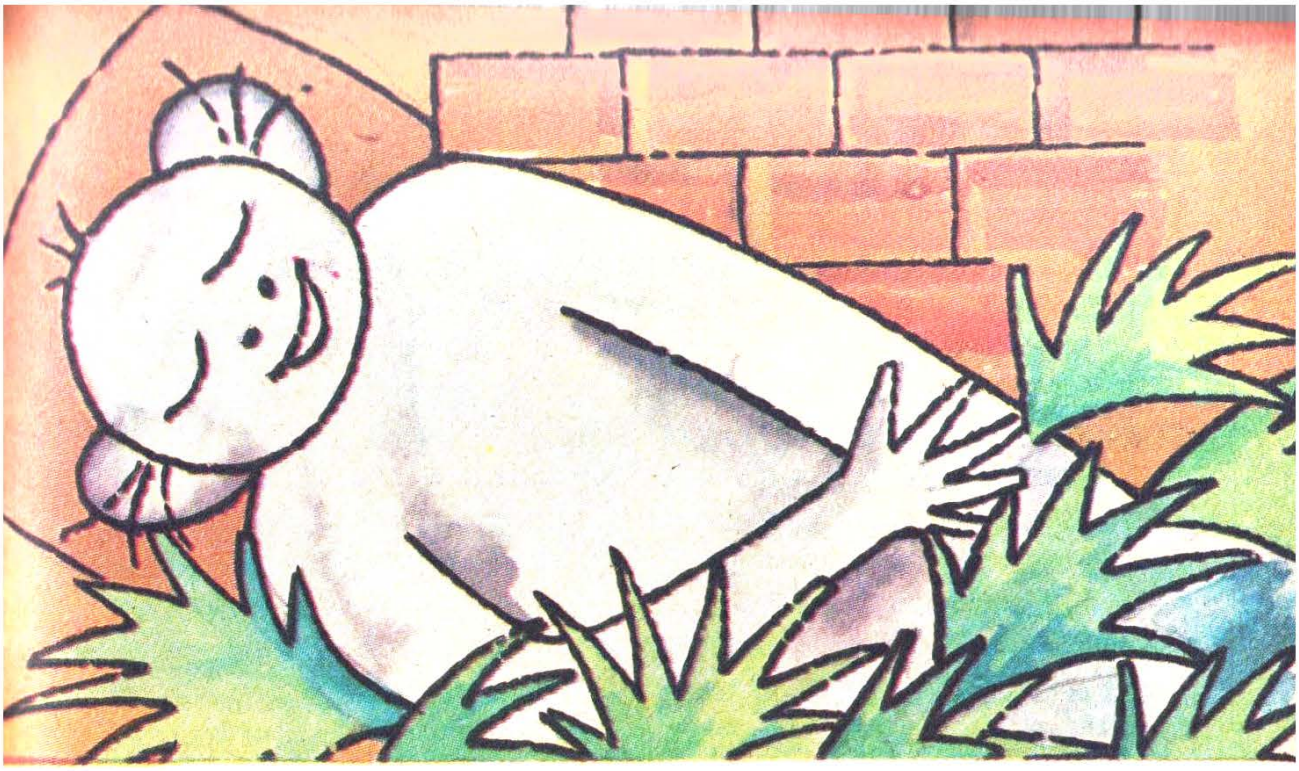

ছিল, তার ডালে মামার জ্বলন্ত দৃষ্টি পড়তেই গোটা দুই গেছো-বাঁদর টুপ-টুপ করে ঝরে পড়ল মাটির ওপর। তারপর ম্যাজিকের মতো গেছোদুটো সেঁধিয়ে গেল মামদো-ভূতের ভয়ঙ্কর শরীরের মধ্যে। কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত কেবল ছিটকে পড়ল চারপাশে।

দেখে হিম হয়ে গেল সন্টুদের শরীর। এখন যদি তাদের দিকে নজর পড়ে মামদো-ভূতের, তাহলে তো তাদের অবস্থাও ওরকম হবে।

কিন্তু বাঁদর-দুটো কেটে পড়তেই সেই মেঘের মতো শরীর থম্ মেরে গেল। তারপর আস্তে আস্তে কেমন যেন গুটিয়ে যেতে লাগল, একসময় কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেল অতবড় শরীরটা।

॥ ৬ ॥

হুঁ-পু বলল, "রানী মিং-মিং আমাকে তলব করেছেন, দুটো নতুন স্যাঙাত এসে কিম্ভূত কাণ্ডকারখানা করছে, চল্ তো যাই।"

আবার সেই কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে লতাপাতার ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁকফোকর ফুঁড়ে এগুল। হুঁ-পুর কোনো অসুবিধে নেই, সে তো গাছের কাণ্ড ভেদ করে ফুরফুর করে হেঁটে চলেছে, কিন্তু সন্টুদের তো ইয়া লম্বা ঠ্যাঙ নেই, বাতাসের মতো হাঁটতেও পারছে না। প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে দুজনে হুঁ-পুর পিছু পিছু। চলতে চলতে এক কাণ্ড, একটা শ্যাওড়াগাছের কাছাকাছি এসেছে, হঠাৎ হুঁ-পুর ঘাড়ের উপর লাফ দিয়ে পড়ল একটা অদ্ভুত মূর্তি।

ঘাড়ের উপর ওটা লাফিয়ে পড়তেই হুঁ-পু প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর বলল, "আরে শাঁকচুন্নিটা ফের জ্বালাতে এসেছে, কী রে প্যাং-প্যাং, কী খবর বল্ ?"

শাঁকচুন্নি প্যাং-প্যাং হুঁ-পুর ঘাড় ধরে ঝুলে আদুরে গলায় বলল, "অনেকদিন ছানার ডালনা খাইনি, বড় নোলা ঝরছে ছানার জন্যে, একদিন আমায় খাওয়াও না

বাপু।"

হুঁ-পু শাঁকচুন্নিকে ঘাড় থেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু ওটা নাছোড়বান্দা, কিছুতেই নামবে না। হুঁ-পু একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তোর শুধু খাই-খাই। তা যা না, ঘোষেদের বাড়ি যা, ওরা ছানা ডাঁই করে রেখেছে ভাঁড়ার-ঘরে।"

আবার ঘ্যান-ঘ্যান করে উঠল প্যাং-প্যাং, "তাহলে আর তোমাকে বলছি কেন বাপু। ওদের বাড়ি যে ঠাকুরপুজো হয়, ঢুকতেই পারিনে। তোমার সঙ্গে দুটো পো-ভূত আছে, দাও না তাদের পাঠিয়ে।"

সন্টু চমকে উঠল, ঘোষেদের বাড়ি কি ছানা চুরি করতে গিয়ে একটা বদনাম কুড়োবে শেষে। হুঁ-পু অবশ্য শাঁকচুন্নিটাকে পাত্তা দিল না, "না-না, হবে না, যা ভাগ। বরং সরকারবাড়ি যা, খাসা মাছ ভাজছে ওরা, গন্ধ বেরুচ্ছে।

"আ-হা," নোলা টানল প্যাং-প্যাং, তারপর হুঁ-পুর ঘাড় থেকে লাফ মারল সে। আর আশ্চর্য, মাটিতে পড়তেই সে একটা ছাইরঙের বেড়াল হয়ে গেল। চোখ-কটা বেড়ালটা লাফ দিয়ে ছুটল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে,. বোধহয় সরকারবাড়ির দিকেই।

যেতে যেতে যে-জায়গাটায় ওরা পৌঁছল, সেটা একটা শ্মশান, এখানে কখনো আসেনি আগে। চার-পাঁচটা চিতা জ্বলছে। দুটো ঝাপসা চেহারার মূর্তি একপাশে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। হুঁ-পু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কে?"

ঝাপসা চেহারার মূর্তির একজন বলল, "আমি পটল-খুড়ো, বিকেলে হাটে গিয়েছিলাম, ফেরবার পথে গোরুর গাড়ি চাপা পড়েছি, তা এখন বাড়ি ফিরতে চাই।"

আর একজন বলল, "আমি বামুনবাড়ি ভোজ খেয়ে কীরকম যেন হয়ে গেছি। কে একজন এসে রানীর কাছে নিয়ে গেল, কোথাকার রানী চিনিও না, দুটো আলখাল্লার মতো পোশাক ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'নাও পরো।' বাড়ি ফিরতে চাইলাম, বলল, 'আর ফেরা যাবে না।' কী মুশকিলে পড়লাম বলো তো?"

সন্টু বুঝল, এরাই রানীর কাছে গিয়ে গোলমাল বাধিয়ে এসেছে। বোধহয় ভূতেদের দেশে সদ্য এসেছে বলে মানিয়ে নিতে পারছে না।

নতুন ভূত দুটোকে হুঁ-পু বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আগে ওই জ্বলন্ত কাঠটাকে হাত দিয়ে তোলো দেখি, তারপর তোমাকে বাড়ি নিয়ে যাব।"

ঝাপসা মূর্তির একটা নিচু হতেই আঁতকে উঠল যেন, ভয়ে দু-পা পিছিয়ে এসে বলল, "পারব না, আগুন দেখে কেমন যেন ভয় করছে।"

হি-হি করে হেসে উঠল হুঁ-পু। "চলো, এবার রানীর কাছে চলো, তোমরা আর কখনো আগুন ছুঁতে পারবে না। আলখাল্লা পরে এখন তোমাদের আমাদের রাজত্বে থেকে যেতে হবে।"

মূর্তিদুটো কেমন বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে থাকল, তারপর হুঁ-পুর পিছু-পিছু হাঁটা শুরু করে দিল।

॥ ৭ ॥

রানীর জিম্মায় নতুন আগন্তুকদের বুঝিয়ে দিয়ে হুঁ-পু আবার জঙ্গলের ভিতরে চলে এল, বাবা বৈষ্ণদত্যি নাকি তাকে স্মরণ করেছে। কড়াহমণ্ডির জঙ্গল পার হয়ে ওরা তিনজন চলে এল শহরের একপ্রান্তে। তিনতলা বাড়ি, বাড়িতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। ঘরে-বারান্দায় ভীষণ ধুলো জমে আছে। ঘরের সামনে একটা বিশাল লন, সেখানে বড়-বড় ঘাস।

দু-তিনটে ঘরের ধুলো মাড়াতে মাড়াতে হঠাৎ একজনের মুখোমুখি হল ওরা। তার পরনে সাদা ধবধবে একটা আলখাল্লা, মুখটা কিন্তু ঢাকা নয়। মুখে দাড়ির মতো রয়েছে। বেশ লম্বা চেহারা, হাতে একটা কমণ্ডলু।

হুঁ-পুকে দেখে বলল, "এসেছিস, এক সের তিল চাই, নইলে ভুজ্যি হবে না।"

হুঁ-পু বোধহয় বাবা বেহ্মদত্যির খাবার-টাবার এনে দেয়, তাই এই তলব।

হুঁ-পুকে তিলের হুকুম দিয়ে বেহ্মদত্যি খড়মের শব্দ তুলে তিনতলা থেকে একতলা, একতলা থেকে তিনতলা ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হুঁ-পু বলল, "এই বাড়িটায় আমাদের নতুন আস্তানা হয়েছে। এক বুড়ো-বুড়ি থাকত এই বাড়িতে, তা একদিন বাসি খাবার খেয়ে দুজনেই পটল তুলেছে। কিন্তু দুজনের কেউই এবাড়ি ছেড়ে নড়ে না। বুড়ো পুজো-আচ্চা করত, অনেক পুন্যি করেছিল বলে মরে গিয়ে বেহ্মদত্যি হয়ে গেছে, আর বুড়ি খুব লোভী ছিল, তাই সে হয়েছে শাঁকচুন্নি। এখন কড়াইমণ্ডির জঙ্গলে এক শ্যাওড়াগাছে থাকে। দুজনে মিলে এ-বাড়ির চার-চারটে ভাড়াটেকে তাড়িয়েছে।

এখন রানী মিং মিং সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঝেমধ্যে এ-বাড়িতে মিটিং করে যায়, ভোজসভা বসায়। শুধু হপ্তায়-হপ্তায় বেহ্মদত্যিকে তিল, সেদ্ধভাত, লুচি-পরোটা দিয়ে যেতে হয় খোরাকি হিসেবে।

হঠাৎ আর একটা লিকলিকে চেহারার কালো ছায়ামূর্তি দেখে ওরা সজাগ হয়ে উঠল। হুঁ-পু কী একটা কাজে দোতলায় গেছে, বিল্টু ফিসফিস করে বলল, "এটা ভূত নয় রে সন্টু, বোধহয় আরেকটা শাঁকচুন্নি।"

ছায়ামূর্তিটা কেমন যেন লেংচাতে লেংচাতে আসছে। সন্টু বলল, "বোধহয় এটাই ব্রহ্মদৈত্যের বউ ছিল।"

বিল্টুদা বলল, "বোধহয় এবার একটা মজা হবে।" ইতিমধ্যে হুঁ-পু এসে গেল ওখানে। শাঁকচুন্নিকে দেখে বলল, "এই যে চিনচিন ঠাকরুন, কেমন চলছে? শুক্কুরবারের ভোজসভায় এলে না কেন?"

খ্যানখেনে গলায় শাঁকচুন্নি চেঁচাল, "ও মা, শুক্কুরবার তো রায়েদের বাড়ি পেতে ছেল, একটিন রসগোল্লা সরিয়ে এনেছিলাম যে, সে এক মহাভোজ হয়েছে সেদিন।"

সন্টুর মনে পড়ল, রায়েদের বাড়ি একটিন রসগোল্লা পাওয়া যাচ্ছে না বলে কী হৈ-চৈ সেদিন! তাহলে সেই ব্যাপারটা এই চিনচিন ঠাকরুনের কাণ্ড!

শাঁকচুন্নিটা এ-বাড়িতে কেন এসেছে, একটু পরে বোঝা গেল। লেংচে-লেংচে খুঁজে বার করল ব্রহ্মদৈত্যকে, তারপর বলল, "শ্যাওড়াগাছে ঝুলে থাকতে কী মজা! চলো, শ্যাওড়াগাছে থাকবে, তোমার জন্যে একটা ভাল ডাল বেছে রেখেছি।"

ব্রহ্মদৈত্যের বিশাল আকারের শরীরটা ঘুরে দাঁড়াল, তার গমগমে গলা পাকাবাড়িখানা কাঁপিয়ে দিল যেন, "আবার এসেছিস তুই, বেঁচে থাকতেও খাই-খাই, আর এখন মরে গিয়েও লোভ গেল না তোর। যা ভাগ, বুড়ি শাঁকচুন্নি। আমি এখন আহ্নিক করতে বসব।"

আহ্নিকের নাম শুনে ছুটে পালিয়ে গেল বুড়ি চিনচিন।

॥ ৮ ॥

বেহ্মদত্যির আখড়া থেকে বেরিয়ে হুঁ-পু বলল, "আমাকে একবার কঙ্ককাটার আস্তানায় যেতে হবে, খুব নাকি চটে আছে রানীর ওপর।"

কঙ্ককাটা কে তা এখনো জানে না সন্টুরা। কতরকম ভূতের সন্ধান যে পেয়ে যাচ্ছে ভূতের রাজত্বে এসে তার ঠিক নেই। তাছাড়া রানীর ওপর যে ভূত চটে আছে সে নিশ্চয়ই দারুণ বদমেজাজি। একটা বড় মাঠের কাছে এসে হুঁ-পু বলল, "তোরা দুজনে এখানে একটু দাঁড়া, আমি কঙ্ককাটার খবর নিয়ে আসি।"

হুঁ-পু তখনো নাগালের বাইরে যায়নি। বিল্টুদা বলল ফিসফিস করে, "চ, আমরা

পায়ে-পায়ে ওদিকটায় এগিয়ে দেখি সট্‌কে পড়ার কোনো উপায় আছে কি না।" একটু এগোতেই দেখল একটা কবরখানার মতো, ইঁটের তৈরি একটা কবরের পাশে কী-সব ইংরেজিতে লেখা। বিল্টুদা বলল, "আরে, এটা তো আমার চেনা জায়গা। একটা সৈন্যসমেত ঘোড়াকে কবর দেওয়া আছে এখানে। যুদ্ধের সময় ইংরেজরা কবর দিয়েছিল ওদের।"

অল্প-অল্প জ্যোৎস্না উঠেছে, তাই দুজনে হনহন করে মাঠের যেদিকটায় আমবাগান, একটু ঝোপঝাপ, সেদিকে এগুতে লাগল। হঠাৎ দেখে, সামনের কাঁচা রাস্তা বেয়ে দুটো লোক আসছে। সন্টু বলল, "বিল্টুদা, এরাও তো মানুষ, এদের কাছে একটু হেল্প চাইলে বোধহয় আমরা বাঁচতে পারি।" কিন্তু লোকদুটো হঠাৎ এতরাতে, এই নির্জন মাঠের ধারে অমন আলখাল্লায় ঢাকা মূর্তি দেখে 'ভূত ভূত' বলে দড়াম করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। দেখেশুনে সন্টুদের তো আক্কেল গুড়ুম। ব্যাপারটা কী! তারা কি তাহলে সত্যি-সত্যিই ভূত হয়ে গেছে দুজনে। কখন মরে গেল তারা?

দু-দুটো সংজ্ঞাহীন মানুষকে পথের ওপর রেখে বিভ্রান্তভাবে কেটে পড়ল ওরা। অল্প-অল্প জ্যোৎস্না মাঠে বেশ ঘোর-ঘোর ভাব লাগিয়েছে। ঠিক এই সময় সন্টুর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ইলেক্‌ট্রিক শক লাগল। জ্যোৎস্না-ভেজা রাত্রে অল্প আলোয় মাঠের মাঝখানে তারা যা দেখল তাতে যে-কোনো মানুষেরই বুকের রক্ত হিম হয়ে যাবার কথা। দেখে, সেই কবর ফুঁড়ে হুশ করে বেরিয়ে এল একটা প্রকাণ্ড ঘোড়া, কালো মিশমিশে রঙ, ভীষণ তেজি আর শক্তিশালী, তার ঘাড়ের লোমগুলো যেমনি চকচকে তেমনি ঝাঁকড়া। আর তার সওয়ারি হয়ে একটা—কী বলা যায়, মুণ্ডহীন ধড় বসে আছে। লোকটা কবন্ধ, অথচ দিব্যি শরীর টান করে সওয়ারি হয়ে বসে আছে, পড়ছে

তো না-ই, উপরন্তু ঘোড়া নিয়ে চরকির মতো ঘুরতে শুরু করল মাঠের চারদিকে। টগবগ-টগবগ শব্দ তুলে যেভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে কবন্ধটা তাতে দুজনেরই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

বিল্টুদা ফিসফিস করে বলল, "এরই নাম কন্ধকাটা রে। হুঁ-পু এর কথাই বলছিল।" ঠিক এই সময় ঘোড়াটা সন্টুদের পাশ দিয়ে ছুটে যেতেই ওরা ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। কবন্ধটার হাতে একটা বড় খাপ-খোলা তলোয়ার জ্যোছনার আলোয় ঝিকমিক-ঝিকমিক করছে।

বিল্টুদা আবার ফিসফিস করে বলল, "এর কথাই তো শুনেছিলাম রে, রোজ রাতে কবর থেকে উঠে এসে মাঠময় ছোটাছুটি করে, অনেকে দেখে ভিরমি খেয়ে মরেছে। শুধু তাই নয়, তার খোলা তলোয়ারের সামনে যে-কেউ পড়বে, অমনি কুচ করে গলাটা কাটা যাবে তার। আর তখন থেকে সেই লোকটাও কন্ধকাটা ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে।

ঘোড়াটা সারা মাঠ ঘুরে ঘুরে এসে দাঁড়াল প্রায় তাদের কাছাকাছি। ঘোড়াটা থামতেই, সেই কবন্ধ লাফ দিয়ে নামল ঘাসের উপর। গলা পর্যন্ত ঢাকা আলখাল্লা, হাতে চকচকে তলোয়ার। সে দুহাত তুলে কী যেন ইশারা করল।

সন্টুরা বুঝতে পারল না, কবন্ধটা ওদের ইশারা করছে কি না। এসময় হুঁ-পু কোত্থেকে এসে হাজির হয়ে ওদের বাঁচাল। হুঁ-পু তার কাছে যেতেই ঘোড়াটা বিকট একটা আওয়াজ করে উঠল, আর কবন্ধ-ভূত তার তলোয়ার বনবন করে ঘুরিয়ে নানারকম সংকেত জানাল। বোঝা গেল, সে দারুণ রেগে রয়েছে। একটু পরে সে ঘোড়া ছুটিয়ে ফের কবরে ঢুকে গেল।

হুঁ-পু হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "নাও ঠ্যালা, কন্ধকাটার জন্যে এখন একশো বাদুড় যোগাড় করতে হবে, সে নাকি কতকাল বাদুড় খায়নি।"

হুঁ-পুর পিছনে ছুটতে ছুটতে সন্টু ভাবল, কন্ধকাটারা যে বাদুড় খেতে ভালবাসে তা তো জানত না। কিন্তু ভাববার বেশি সময় নেই, হুঁ-পু ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

॥ ৯ ॥

সারা রাত ধরে এভাবে ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়ল সন্টু আর তার বিল্টুদা। বেশ ঘুম-ঘুম পাচ্ছে তাদের, অথচ হুঁ-পুকে সে-কথা বলাও যায় না। আর হুঁ-পুও একেবারে চোখে-চোখে আগলে রেখেছে ওদের, একলহমার জন্য হাতছাড়া করছে না। এখন কী উপায় ? কীভাবে এর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া যায় ! বিল্টুদা একবার ফিসফিস করে বলেছিল, "বুঝলি সন্টু, একবার চোখের আড়াল হলেই দুজনে ছুট দেব, একছুটে পগার পার। কিন্তু সামনাসামনি কখনো ছুটবি নে, তাহলে আর ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাবে না। দেবে ঘাড় মটকে।"

সেটা এতক্ষণে সন্টুও বুঝে ফেলেছে। পথে হাঁটতে-হাঁটতে ওদের সঙ্গে দেখা হল আর এক ছায়ামূর্তির। তার গায়ে আলখাল্লা ধরনের কিছু নেই। তার চোখদুটো কুতকুতে, কপালটা ফোলা, গোদা-গোদা পা, মাথাটা ন্যাড়া, দাঁত নেই। হুঁ-পু-র কাছে ওরা জানতে পারল এ হল প্রেতাত্মা। এই প্রেতাত্মাটার নাম চিঁ-চিঁ, তার গলার আওয়াজও তার নামের মতো।

হুঁ-পু বিল্টুদের বলল, "এই, তোরা এই গাছটার ডালে একটু বোস, আমি চিঁ-চিঁর সঙ্গে একটা কাজ সেরে আসি।" এই না বলে হাত লম্বা করে ওদের দুজনকে বসিয়ে দিল গাছের মগডালে।

হুঁ-পু আর চিঁ-চিঁ চোখের আড়াল হতেই বিল্টুদা বলল, "সন্টু, এই সুযোগ, চ' নেমে পড়ি।"

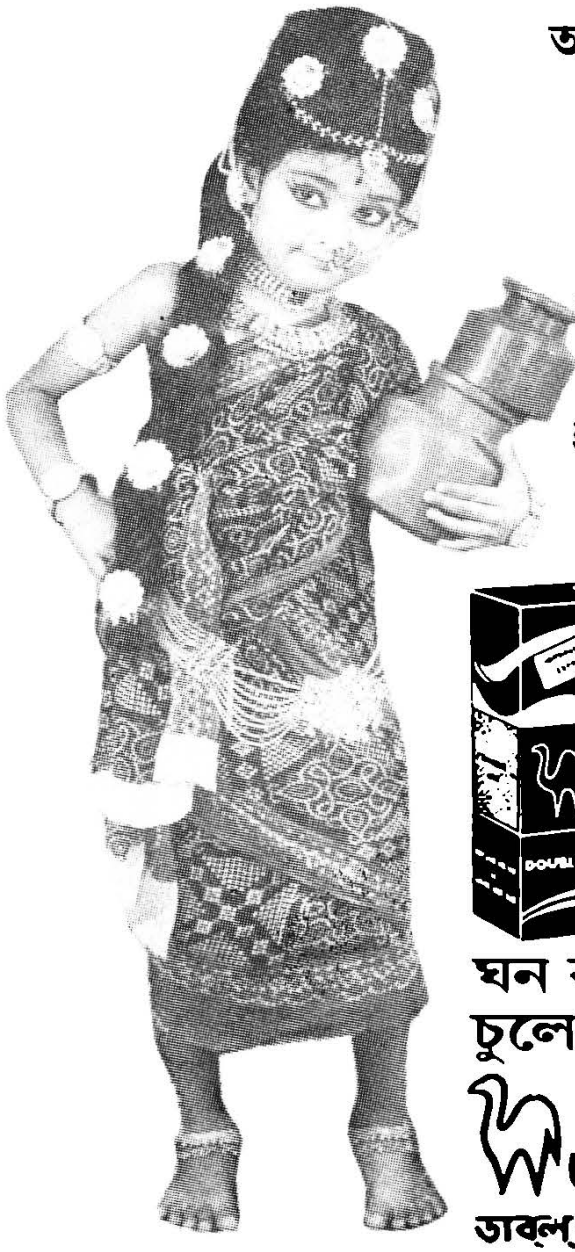

আকাশ ঘিরে মেঘ করেছে
সূর্য্যি গেল পাটে ।
খুকু গেল জল আনতে
পদ্ম দিঘির ঘাটে ॥
পদ্ম দিঘির কালো জলে
হরেক রকম ফুল ।
হাঁটুর উপর দুলছে খুকুর
গোছাভরা চুল ॥

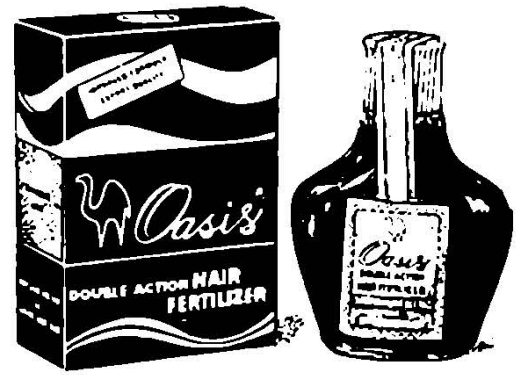

ঘন কালো সুন্দর
চুলের জন্য

ওয়েসিস®
ডাবল অ্যাকশন
হেয়ার ফার্টিলাইজার

প্রস্তুত কারক :
HRI হার্বল রিসার্চ ইনস্টিটিউট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
সব বড় দোকানে পাওয়া যায় ।

অনেক কষ্টে ওরা গাছ থেকে নেমে দেখল, সামনে একটা ঝোপ-ঝোপ জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে একটা কাঁচা পথ। পথটা জঙ্গলের ভিতরে এগিয়ে গিয়েছে, সেই পথ বরাবর ছুট লাগাল ওরা দুজন। মুখের ঢাকাটা ওরা সরিয়ে ফেলেছে, তাতে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না বটে, কিন্তু লতাপাতা, ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে ছুটতে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

ছুটতে-ছুটতে হঠাৎ বিল্টুদা সন্টুর হাত ধরে চট করে থেমে গেল, তারপর দুজনে লুকিয়ে পড়ল একটা বড়সড় কাঁঠালগাছের পিছনে। দুটো ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে হনহন করে। সন্টুর বুকটা কেঁপে উঠল, ওদের দেখে ফেলেনি তো ছায়ামূর্তি দুটো!

একটু পরেই আলখাল্লা-পরা মূর্তিদুটো লম্বা-লম্বা পা ফেলে ওদের পাশ দিয়ে চলে গেল। ভাগ্যিস ওদের দেখতে পায়নি! একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিল্টুদা বলল, "আয় সন্টু, পালাই।"

আবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল দুজনে। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে ছোটার পরে ওরা থামল একটা মাঠের কাছে। মাঠে নতুন লাঙল দেওয়া হয়েছে বলে দৌড়োতে পারছে না ওরা, পায়ে জুতো নেই, তার উপর আলখাল্লাটা ফেলতেও পারছে না। একদণ্ড জিরোবার জন্য ওরা মাঠের পাশে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল।

আর যেই না বসেছে, অমনি চোখে অন্ধকার দেখল দুজনে। কে যেন তাদের দুজনের গলা চেপে ধরে শূন্যে তুলে ধরেছে, আর ঝড়ের বেগে নিয়ে যাচ্ছে অন্য কোথাও। চুল-টুল খাড়া হয়ে উঠেছে, গায়ের আলখাল্লা উড়ছে পতাকার মতো। কোথায় চলেছে তারা?

॥ ১০ ॥

সন্টুর মনে হল, তাদের পিঠে কেউ যেন একজোড়া করে পাখা লাগিয়ে দিয়েছে, আর তাতে ভর করে ঝড়ের মতো ছুটে চলেছে তারা। সম্ভবত তাদের পালাবার ব্যাপারটা ছায়ামূর্তিদের কেউ দেখে ফেলেছে। এতক্ষণ ভূতের রাজ্যে দিব্যি ধাপ্পা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ওরা, কিন্তু এবার আর নিস্তার নেই। সন্টুর বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠল, এবার নির্ঘাত ঘাড় মটকে মেরে ফেলা হবে ওদের।

ঝড়ের বেগে উড়তে উড়তে তারা এসে নামল ইস্কুল-ঘরের মতো বিরাট লম্বা একটা বাড়ির সামনে। জায়গাটা সন্টুর বেশ চেনা চেনা। এই মাঠে সে ফুটবল-খেলা দেখতে এসেছে অনেকবার।

এই মাঠে তারা নিজেরাই নেমে এল, না কেউ তাদের নামিয়ে দিল, সন্টু বুঝতে পারল না। বিল্টুদাও ওর দিকে ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে আছে, কথা বলতে পারছে না, কী ভাবে এখানে ঝড়ের মতো উড়ে এল বুঝতে পারছে না। আলখাল্লার ভেতর থেকে মুখটা বার করে সন্টু বলল, "বিল্টুদা, কী হবে?"

বলতে বলতে দেখতে পেল, একটা ছায়ামূর্তি হনহন করে হেঁটে আসছে। দেখতে পেয়ে তাদের বুকের ভেতর আবার হিম হয়ে এল। নাহ্! তারা এই ভূতের রাজ্য থেকে আর নিস্তার পাবে না।

ছায়ামূর্তি কাছে আসতেই সন্টু চিনে ফেলল, এর নাম গাঁ-পে। হুঁ-পুরই বন্ধু। কিছুক্ষণ আগে একে রানীর সভায় দেখেছে, একটা শকুনের ডিম বেশি খেয়ে ফেলেছিল বলে রানী খুব বকে দিয়েছিল। এর আবার কী মতলব কে জানে! গাঁ-পে ওদের দেখতে পেয়েই বলে উঠল, "এই যে পো-ভূতদুটো, কোথায় কেটে পড়ছিলি দুজনে। হুঁ-পু তো তোদের খোঁজে হাল্লা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভাগ্যিস রমণ্ডির কাছে তোদের দেখতে পেয়েছিলাম।"

রমণ্ডি কী জিনিস বা কোন্ জায়গা তা

বুঝতে পারল না ওরা। গাঁ-পে বলল, "তোদের হুঁ-পুর কাছে নিয়ে গেলে বেশ একটা মজা হবে।" বলে সে এমন হি-হি হি-হি করে হাসতে শুরু করল যে সন্টুর পিলে চমকে উঠল। হুঁ-পু যে কী করবে কে জানে!

কিন্তু হুঁ-পু কোথায়? গাঁ-পে বলল, "তোরা তো আমাদের আখড়া থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছিস, চিনে যেতে পারবি তো?"

বিল্টুদা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হুঁ-হুঁ।" ভাবল, এতে যদি গাঁ-পের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু তাতে উলটো ফল হল। গাঁ-পে বলল, "চিনতে পারবি না, মহা মুশকিল তো। আচ্ছা, তাহলে তোদের আর একবার ভাসান দিই হাওয়ায়, যেভাবে রমণ্ডি থেকে ফিরিয়ে এনেছি। বলে আবার দুজনের গলার কাছটা চেপে ধরল, তারপর সজোরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিল। চোখে আবার সর্ষেফুল ফোটে ওদের, সেই পাখা লাগিয়ে ওড়ার মতো আবার ভেসে চলল মহাশূন্যের দিকে। দুজনেই পাশাপাশি উড়ছে, অথচ কেউ কাউকে কিছু বলতে পারছে না। এমন অসহায়ের মতো উড়তে উড়তে কতক্ষণ পরে কে জানে, ওরা আবার টিপ্ করে ল্যাণ্ড করল সেই নীচে, যে-মগডালে হুঁ-পু ওদের বসিয়ে রেখে গিয়েছিল।

হুঁ-পু ওদের দেখে হাতে স্বর্গ পেল। স্বর্গ না নরক, ভূতেরা হাতে কী পায় কে জানে! দুজনকে বগলদাবা করে একপাক বাঁই করে ঘুরে গেল। আর নাকি সুরে কী সব বলতে লাগল। তার মধ্যে 'রমণ্ডি' শব্দটা শুনতে পেল ওরা।

রমণ্ডি শব্দটার মানে জানতে পারল ওরা একটু পরে। হুঁ-পু জানাল, ওদের দুজনের নাকি পৃথিবীতে ফিরে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। পৃথিবীতে যাবার ইচ্ছে হলে ভূতেরা যে জায়গায় চলে যায়, তার নাম রমণ্ডি। রমণ্ডিতে গেলেই আস্তে-আস্তে ভূত থেকে প্রেতাত্মা হয়ে যায়। উঁ-উঁ আর কুঁই-কুঁই আর একটু হলেই প্রেতাত্মা হয়ে যাচ্ছিল।

এখন ওদের দুজনকে এই ইচ্ছের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত কী—তাও হুঁ-পু জানিয়ে দিল। ওদের দুজনকেই এখন চুয়াল্লিশটা করে শকুনের ডিম খেতে হবে।

শুনে তো ওদের প্রাণ উড়ে যাবার যোগাড়। হুঁ-পু ওদের রানীর দরবারের পাশের ঘরে এনে হাজির করে বলল, "বোস্, খানসামা ডাকি, শকুনের ডিম আনুক।" আলখাল্লার ভিতর দিয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল! এবার কী করবে ওরা?

এবার আর নিস্তার নেই। ভাবতে ভাবতে টুপিপরা খানসামা এল, দু-গামলা ভর্তি শকুনের ডিম নিয়ে। ইয়া বড় বড় ডিম। দেখে তো ওদের দুজনের ভিরমি খাবার যোগাড়।

হুঁ-পু এসে বলল, "নে, চটপট খেয়ে নে।" আলখাল্লার ভিতর দিয়ে ওরা আবার চোখাচোখি করল, তারপর বিল্টুদা এক কাণ্ড করে বসল। চট করে পকেট থেকে বার করল একটা দেশলাই, কখন যেন পথে কুড়িয়ে পেয়েছিল। ফশ্ করে দেশলাই জ্বালতেই অবাক কাণ্ড! কোথায় হুঁ-পু, আর কোথায় রানী মিং-মিং! মুহূর্তে ভূতের রাজত্ব একেবারে ফর্সা। সন্টুর ধড়ে এবার যেন প্রাণ ফিরে এল, আর বিল্টুদাও আনন্দে সন্টুকে নিয়ে তুলে ধরল উঁচুতে, তা-থৈ তা-থৈ নৃত্য করতে লাগল। আর সেই ঝাঁকুনিতে ঘুম ভেঙে গেল সন্টুর। দেখে, সামনে দাঁড়িয়ে বিল্টুদা, হাতে ফলসার রাশ। বলছে, "কী রে, গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিস এখানে!"

ছবি : প্রবীর সেন